কনে দেখা-বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

সকালবেলা বৈঠকখানার গাছপালার হাটে ঘুরছিলাম।
গত মাসে হাটে কতকগুলি গোলাপের কলম কিনেছিলাম, তার মধ্যে বেশিরভাগ পোকা লেগে নষ্ট হয়ে গেছে। নার্সারির লোক আমার জানাশুননা, তাদের বললাম,-কীরকম কলম দিয়েছিলে হে! সে যে টবে বসাতে দেরি সইল না! তা ছাড়া আবদুল কাদের বলে বিক্রি করলে, এখন সবাই বলছে আবদুল কাদের নয় ও, অত্যন্ত মামুলি জাতের টি রোজ। ব্যাপার কী তোমাদের?
নার্সারির পুরোনো লোকটাই আজ আছে। সেদিন এ ছিল না, তাই ঠকেছিলাম। এই লোকটা খুব অপ্রতিভ হল। বললে—বাবু, এই হয়েছে কী জানেন? বাগানের মালিকেরা আজকাল আছেন কলকাতায়। আমি একা সব দিক দেখতে পারিনে, ঠিকে উড়ে মালী নিয়ে হয়েছে কাজ। তাদের বিশ্বাস করলে চলে না, আবার না করলেও চলে না। আমি তো সবদিন হাট সামলাতে পারিনে বাবু, ওদেরই ধরে পাঠাতে হয়। আমি বুনেছিলাম টি রোজ তিনডজন, আমি তো তার কাছ থেকে টি রোজেরই দাম নেব? এখানে এসে যদি আবদুল কাদের বলে বিক্রি করে তো তারই লাভ। বাড়তি পয়সা আমার নয়, তার। বুঝলেন না বাবু?
বাজার খুব জেঁকেছে। বর্ষার নওয়ালির মুখ, নানাধরনের গাছের আমদানি হয়েচে। বড়ো বড়ো বিলিতি দোপাটি, মতিয়া, বেল, অতসীলতা, রাস্তার ধারের সারিতে নানাধরনের পাম, ছোটো ছোটো পাম থেকে ফ্যান পাম ও বড়ো টবে ভালো এরিকা পামও আছে। সূর্যমুখীর যদিও এ সময় নয়, কিন্তু সূর্যমুখী এসেছে অনেক। তা ছাড়া কলকাতার রাস্তায় অনভিজ্ঞ লোকদের কাছে অর্কিড বলে যা বিক্রি হয়, সেই নারকেলের ছোবড়া ও তার-বাঁধা ফার্ন ও রঙিন আগাছা যথেষ্ট বিক্রি হচ্ছে। লোকের ভিড়ও বেশ।
হঠাৎ দেখি আমার অনেকদিন আগেকার পুরোনো রুমমেট হিমাংশু। ৭/৩নং কানাই সরকারের লেনে মেসে তার সঙ্গে অনেক দিন একঘরে কাটিয়েছি। সে আজ সাত-আট বছর আগেকার কথা—তারপর সে কলকাতা ছেড়ে চলে যায়। আর তার কোনো খবর রাখিনি আজকাল।
—এই যে হিমাংশু? চিনতে পারো?
হিমাংশু চমকে পেছন ফিরে চাইলে এবং কয়েক সেকেন্ড সবিস্ময়ে আমার দিকে চেয়ে থাকবার পরে সে আমার চিনলে। হাত বাড়িয়ে এগিয়ে এল হাসিমুখে।
-আরে জগদীশবাবু যে! তারপর? ওঃ আপনার সঙ্গে একযুগ পরে ওঃ! তারপর আছেন কেমন বলুন!
আমি বললাম তোমার গাছপালার শখ দেখচি আছে হিমাংশু, সেই মনে আছে দুজনে কতদিন এখানে হাটে আসতাম? হিমাংশু হেসে বললে—তা আর মনে নেই? সেই আপনি দার্জিলিংয়ের লিলি কিনলেন? আপনার তো খুব শখ ছিল লিলির। এখনও আছে? আসুন, আসুন, অন্য কোথাও গিয়ে একটু বসি। ও মেসটার কোনো খবর আর রাখেন নাকি? আচ্ছা সেই অনাদিবাবু কোথায় গেল খোঁজ রাখেন? আর সেই যে মেয়েটি স্টোভ জ্বালাতে গিয়ে গা-হাত পুড়িয়ে ফেললে, মনে আছে? তার বিয়ে হয়েছে?
দুজনে গিয়ে একটা চায়ের দোকানে বসলাম। এগল্প-ওগল্প—নানা পুরোনো দিনের কথা। তার কথাবার্তার ভাবে বুঝলাম সে কলকাতায় এসেছে অনেক দিন পরে।
জিজ্ঞেস করলাম—আজকাল কোথায় থাকো হিমাংশু?
সে বললে—বি. এন. আর.-এর একটি স্টেশনে বুকিং-ক্লার্ক ছিলাম। টাটানগরের ওদিকে, কিছুদিন থাকবার পর দেখলাম জায়গাটার মাটিতে ভারি চমৎকার ফুল জন্মায়, জমিও সস্তা। সেইখানেই এখন আছি—ফুলের বাগান করেচি—তুমি তো জানো বাগানের শখ আমার চিরকাল। কিছু চাষবাসের জমি নিয়েছি, তাতেই চলে যায়। কিন্তু সেসব কথা থাক—আজ এখন একটা গল্প করি শোনো। গল্পের মতো শোনাবে, কিন্তু আসলে সত্যি ঘটনা। আর আশ্চর্য এই, দশ বছর আগে যখন তোমাদের মেসে থাকতাম তখন এ গল্পের শুরু, এবং এর সমাপ্তি ঘটেছে গতকাল। আমি বললাম—ব্যাপার কী, তোমার কথা শুনে মনে হচ্ছে নিশ্চয়ই প্রেমের কাহিনি জড়ানো আছে এর সঙ্গে। বলো বলো। সে বললে—না, সেসব নয়। অন্য এক ব্যাপার, কিন্তু আমার পক্ষে কোনো প্রণয়কাহিনির চেয়ে তা কম মধুর নয়। শোনো বলি। আচ্ছা তোমার মনে আছে—মেসে থাকতে আমি একটা এরিকা পাম কিনেছিলাম, আমাদের ঘরের সামনে টবে বসানো ছিল, মনে আছে? আচ্ছা তা হলে শোনো।
তারপর আধঘন্টা বসে হিমাংশু তার গল্পটা বলে গেল। আমরা আরও দু-বার চা খেলাম, একবাক্স সিগারেট পোড়ালাম। বউবাজারের মোড়ে গির্জার ঘড়িটায় সাড়ে ন-টা যখন বাজল, তখন হিমাংশু গল্প শেষ করে বিদায় নিয়ে চলে গেল।

তার গল্পটা আমি আমার নিজের কথায় বলব, কেননা হিমাংশু সম্বন্ধে কিছু জানা থাকা দরকার, গল্পটা ঠিক বুঝতে হলে, সেটা আমাকে গোড়াতেই বলে দিতে হবে।
হিমাংশু যখন আমার সঙ্গে থাকত, তখন তার চালচলন দেখলে মনে হবার কথা যে, সে বেশ অবস্থাপন্ন ঘরের ছেলে। সে যে আহার-বিহারে বা বেশভূষায় খুব বেশি শৌখিন ছিল তা নয়, তার শখ ছিল নানা ধরনের এবং এই শখের পেছনে সে পয়সা ব্যয় করত নিতান্ত বেআন্দাজি।
তার প্রধান শখ ছিল গাছপালা ও ফুলের। আমার ফুলের শখটা হিমাংশুর কাছ থেকেই পাওয়া এ কথা বলতে আমার কোনো লজ্জা নেই। কারণ যত তুচ্ছ, যত অকিঞ্চিৎকর জিনিসই হোক না-কেন, যেখানে সত্যি কোনো আগ্রহ বা ভালোবাসার সন্ধান পাওয়া যায়—তাকে শ্রদ্ধা না-করে পারা যায় না।
হিমাংশুর গাছপালার ওপর ভালোবাসা ছিল সত্যিকার জিনিস। সে ভালো খেত, ভালো কাপড়জামা কখনো দেখিনি তার গায়ে—কিন্তু ও ধরনের সুখস্বাচ্ছন্দ্য তার কাম্যও ছিল না। তার পয়সার সচ্ছলতা ছিল না কখনো, টুইশনি করে দিন চালাত, তাও আবার সবসময় জুটত না, তখন বন্ধুবান্ধবদের কাছে ধার করত। যখন ধারও মিলত না তখন দিনকতক চন্দননগরে এক মাসির বাড়ি গিয়ে মাসখানেক, মাস-দুই কাটিয়ে আসত। কিন্তু পয়সা হাতে-হলে কাপড়–জামা না কিনুক, খাওয়া-দাওয়ায় ব্যয় করুক-না-করুক, ভালো গাছপালা দেখলে কিনবেই।
মেসে আমাদের ঘরের সামনে ছোটো একটা অপরিসর বারান্দাতে সে তার গাছপালার টবগুলো রাখত। গোলাপের ওপর তার তত ঝোঁক ছিল না, সে ভালোবাসত নানাজাতীয় পাম—আর ভালোবাসত দেশি-বিদেশি লতা—উইস্টারিয়া, অতসী, মাধবীলতা, বোগেনভিলিয়া ইত্যাদি। কত পয়সাই যে এদের পিছনে খরচ করেছে!
সকালে উঠে ওর কাজই ছিল গাছের পাট করতে বসা। শুকনো ডালপালা ভেঙে দিচ্ছে, গাছ ঘেঁটে দিচ্ছে, এ-টবের মাটি ও-টবে ঢালচে। পুরোনো টব ফেলে দিয়ে নতুন টবে গাছ বসাচ্ছে, মাটি বদলাচ্ছে। আবার মাঝে মাঝে মাটির সঙ্গে নানারকমের সার মিশিয়ে পরীক্ষা করছে। এসব সম্বন্ধে ইংরেজি বাংলা নানা বই কিনত—একবার কী একটা উপায়ে ও একই লতায় নীলকলমি ও সাদাকলমি ফোটালে। ভায়োলেটের ছিট ছিট দেওয়া অতসী অনেক কষ্টে তৈরি করেছিল। বেগুনি রং-এর ক্রাইসেনথিমামের জন্যে অনেক পরিশ্রম ও অর্থ ব্যয় করেছিল, সুবিধে হয়নি।
তা ছাড়া ও ধরনের মানুষ আমি খুব বেশি দেখিনি, যে একটা খেয়াল বা শখের পেছনে সমস্ত মনপ্রাণ ঢেলে দিতে পারে। মানুষের মনের শক্তির সে একটা বড়ো পরিচয়। হিমাংশু বলত—সেদিন একটা পাড়াগাঁয়ে একজনদের বাড়ি গিয়েছি, বুঝলেন?...তাদের গোলার কাছে তিন বছরের পুরোনো নারকেল গাছ হয়ে আছে। সে যে কী সুন্দর দেখাচ্ছে! একটা প্রকাণ্ড তাজা, সতেজ, সবুজ পাম! সমুদ্রের ধারে নাকি নারকেলের বন আছে—পাম-এর সৌন্দর্য দেখতে হলে সেখানে যেতে হয়।
হিমাংশু প্রায়ই পাম আর অর্কিড দেখতে শিবপুর বোটানিক্যাল গার্ডেনে যেত। আর এসে তাদের উচ্ছ্বসিত বর্ণনা করত।
একবার সে একটা এরিকা পাম কিনে আনলে। খুব ছোটো নয়, মাঝারিগগাছের মাটির টবে বসানো—কিন্তু এমন সুন্দর, এমন সতেজ গাছ বাজারে সাধারণত দেখা যায় না। সে সন্ধান করে করে দমদমায় কোনো বাগানের মালিকে ঘুষ দিয়ে সেখান থেকে কেনে। কলকাতার মেসের বারান্দায় গাছ বাঁচিয়ে রাখা যে কত শক্ত কাজ, যাঁদের অভিজ্ঞতা আছে তাঁরা সহজেই বুঝতে পারবেন। গোবি মরুভূমিতে গাছ বাঁচিয়ে রাখা এর চেয়ে সহজ। একবার সে আর আমি দিন-কুড়ি-বাইশের জন্যে কলকাতায় বাইরে যাই; চাকরকে আগাম পয়সা পর্যন্ত হিমাংশু দিয়ে গেল গাছে জল দেবার জন্যে, ফিরে এসে দেখা গেল ছ-সাতটা ফ্যান পাম শুকিয়ে পাখা হয়ে গেছে।
সকালে-বিকালে হিমাংশু বালতি বালতি জল টানত একতলা থেকে তেতলায়
টবে দেবার জন্যে। গাছ বাড়ছে না কেন এর কারণ অনুসন্ধান করতে তার উদবেগের অন্ত ছিল না। অন্যসব গাছের চেয়ে কিন্তু ওই এরিকা পাম গাছটার ওপর তার মায়া ছিল বেশি, তার খাতা ছিল—তাতে লেখা থাকত কোন কোন মাসে কত তারিখে গাছটা নতুন ডাল ছাড়লে। গাছটাও হয়ে পড়ল প্রকাণ্ড, মাটির টব বদলে তাকে পিপে-কাটা কাঠের টবে বসাতে হল। মেসের বারান্দা থেকে নামিয়ে একতলায় উঠোনে বসাতে হল। এসবে লাগল বছর পাঁচ-ছয়।
সেবার বাড়িওয়ালার সঙ্গে বনিবনাও না-হতে আমাদের মেস ভেঙে গেল।
দুজনে আর একত্র থাকবার সুবিধে হল না, আমি চলে গেলাম ভবানীপুর। হিমাংশু গিয়ে উঠল শ্যামবাজারে আর একটা মেসে। একদিন আমায় এসে বিমর্ষ মুখে বললে—কী করি জগদীশবাবু, ও মেসে আমার টবগুলো রাখবার জায়গা হচ্ছে না—অন্য অন্য টবের না-হয় কিনারা করতে পারি, কিন্তু সেই এরিকা পামটা সেখানে রাখা একেবারে অসম্ভব। একটা পরামর্শ দিতে পারেন? অনেকগুলো মেস দেখলাম, অত বড়ো গাছ রাখবার সুবিধে কোথাও হয় না। আর টানাটানির খরচাও বড়ো বেশি।
আমি তাকে কোনো পরামর্শ দিতে পারিনি বা তারপর থেকে আমার সঙ্গে আজকার দিনটি ছাড়া আর কোনোদিন দেখাও হয়নি।
বাকিটা হিমাংশুর মুখে আজই শুনেছি।

কোনো উপায় না-দেখে হিমাংশু শেষে কোনো বন্ধুর পরামর্শে ধর্মতলার এক নীলামওয়ালার কাছে এরিকা পামের টবটা রেখে দেয়। রোজ একবার করে গিয়ে দেখে আসত, খদ্দের পাওয়া গেল কিনা। শুধু যে খদ্দেরের সন্ধানে যেত তা নয়, ওটা তার একটা ওজুহাত মাত্র—আসলে যেত গাছটা দেখতে।

হিমাংশু কিন্তু নিজের কাছে সেটা স্বীকার করতে চাইত না। দু-দিন পরে যা পরের হয়ে যাবে, তার জন্যে মায়া কীসের? তবুও একদিন যখন গিয়ে দেখলে, গাছটার সে নধর, সতেজ-শ্রী যেন ম্লান হয়ে এসেছে, নীলামওয়ালারা গাছে জল দেয়নি, তেমন যত্ন করেনি—সে লজ্জিত মুখে দোকানের মালিক একজন ফিরিঙ্গি ছোকরাকে বললে—গাছটার তেমন তেজ নেই —এই গরমে জল না-পেলে, দেখতে ভালো না-দেখালে বিক্রি হবে কেন? জল কোথায় আছে, আমি নিজে না-হয়—কারণ দু-পয়সা আসে, আমারই তো আসবে–

তারপর থেকে যেন পয়সার জন্যেই করছে, এই অছিলায় রোজ বিকেলে নীলামওয়ালার দোকানে গিয়ে গাছে জল দিত। এক-একদিন দেখত দোকানের চাকরেরা আগে থেকেই জল দিয়েছে।

রোজ নীলামের ডাকের সময় সে সেখানে উপস্থিত থাকত। তার গাছটার দিকে কেউ চেয়েও দেখে না—লোকে চেয়ার, টেবিল, সোফা, আলমারি কিনচে, ভাঙা পুরোনো ক্লক ঘড়ি পর্যন্ত বিক্রি হয়ে গেল, কিন্তু গাছের শখ খুব বেশি লোকের নেই, গাছটা আর বিক্রি হয় না। একদিন নীলামওয়ালা বললে—বাবু, গাছটার তো সুবিধে হচ্ছে না, তুমি নিয়ে যাবে ফেরত?

কিন্তু ফেরত নিয়ে গিয়ে তার রাখবার জায়গা নেই, থাকলে এখানে সে বিক্রির জন্যে দিয়েই বা যাবে কেন? সে-সময় তার অত্যন্ত খারাপ যাচ্ছে, চাকুরির চেষ্টায় আকাশ-পাতাল হাতড়ে কোথাও কিছু মিলছে না—নিজের থাকবার জায়গা নেই তো পিপে-কাটা কাঠের টবে বসানো অত বড়ো গাছ রাখে কোথায়?

মাসখানেক পরে হিমাংশুর অবস্থা এমন হল যে আর কলকাতায় থাকাই চলে। কলকাতার বাইরে যাবার আগে গাছটার একটা কিনারা হয়ে গেলেও মনে শান্তি পেত। কিন্তু আজও যা, কালও তাই—নীলামওয়ালাকে কমিশনের রেট আরও বাড়িয়ে দিতে হয়েছে গাছটা রাখবার জন্যে, নইলে সে দোকানে রাখতে চায় না। কিন্তু হিমাংশুর দুর্ভাবনা এই যে, ও কলকাতা ছেড়ে চলে গেলে গাছটার আর যত্ন হবে না, নীলামওয়ালার দায় পড়েছে, কোথাকার একটা এরিকা পামগাছ বাঁচল কী মোলো—অত তদারক করবার তার গরজ নেই।

কিন্তু শেষে বাধ্য হয়ে কলকাতা ছাড়তে হল হিমাংশুকে।

অনেকদিন পরে সে আবার এল কলকাতায়। নীলামওয়ালার দোকানে বিকেলে গেল গাছ দেখতে। গাছটা নেই, বিক্রি হয়ে গিয়েছে সাড়ে সাত টাকায়। কমিশন বাদ দিয়ে হিমাংশুর বিশেষ কিছু রইল না। কিন্তু টাকার জন্যে ওর তত দুঃখ নেই, এত দিন পরে সত্যি সত্যিই গাছটা পরের হয়ে গেল!

তার প্রবল আগ্রহ হল গাছটা সে দেখে আসে। নীলামওয়ালা সাহেব প্রথমে ঠিকানা দিতে রাজি নয়, নানা আপত্তি তুললে—বহু কষ্টে তাকে বুঝিয়ে ঠিকানা জোগাড় করলে। সার্কুলার রোডের এক সাহেবের বাড়িতে গাছটা বিক্রি হয়েছে, হিমাংশু পরদিন সকালে সেখানে গেল। সার্কুলার রোডের ধারেই বাড়ি, ছোটো গেটওয়ালা কম্পাউন্ড, উঠোনের একধারে একটা বাতাবি লেবুগাছ, গেটের কাছে একটা চারা পাকুড়গাছ। সাহেবের গাছপালার শখ আছে—পাম অনেকরকম রেখেছে, তার মধ্যে ওর পামটাই সকলের বড়ো। হিমাংশু বলে, সে হাজারটা পামের মধ্যে নিজেরটা চিনে নিতে পারে। কম্পাউন্ডে ঢুকবার দরকার হল না, রাস্তার ফুটপাত থেকেই বেশ দেখা যায়, বারান্দায় উঠবার পৈঠার ধারেই তার। পিপে-কাটা টবসুদ্ধ পামগাছটা বসানো রয়েছে। গাছের চেহারা ভালো—তবে তার কাছে থাকবার সময় আরও বেশি সতেজ, সবুজ ছিল।

হিমাংশুর মনে পড়ল এই গাছটার কবে কোন ডাল গজালো—তার খাতায় নোট করা থাকত। ও বলতে পারে প্রত্যেকটি ডালের জন্মকাহিনি—একদিন তাই ওর মনে ভারি কষ্ট হল, সেদিন দেখলে সাহেবের মালি নীচের দিকের ডালগুলো সব কেটে দিয়েছে। মালিকে ডাকিয়ে বললে—ডালগুলো ওরকম কেটেচ কেন? মালিটা ভালো মানুষ। বললে—আমি কাটিনি বাবু, সাহেব বলে দিল নীচের ডাল না-কাটলে ওপরের কচি ডাল জোর পাবে না। বললে, টবের গাছ না-হলে ও ডালগুলো আপনা থেকেই ঝরে পড়ে যেত।

হিমাংশু বললে—তোমার সাহেব কিছু জানে না। যা ঝরে যাবার তা তো গিয়েচে, অত বড়ো গুঁড়িটা বার হয়েছে তবে কী করে? আর ভেঙো না।

বছর তিন-চার কেটে গেল। হিমাংশু গাছের কথা ভুলেচে। সে গালুডি না ঘাটশিলার ওদিকে কোথাও জমি নিয়ে বসবাস করে ফেলেছে ইতিমধ্যে।

গাছপালার মধ্যে দিয়েই ভগবান তার উপজীবিকার উপায় করে দিলেন। এখানে হিমাংশু ফুলের চাষ আরম্ভ করে দিলে সুবর্ণরেখার তীরে। মাটির দেয়াল তুলে খড়ের বাংলো বাঁধলে। একদিকে দূরে অনুচ্চ পাহাড়, নিকটে দূরে শালবন, কাঁকর মাটির লাল রাস্তা, অপূর্ব সূর্যোদয় ও সূর্যাস্ত।

ফুলের চাষে সে উন্নতি করে ফেললে খুব শিগগির। ফুলের চেয়েও বেশি উন্নতি করেচে চিনা ঘাস ও ল্যাভেন্ডার ঘাসের চাষে। এই জীবনই তার চিরদিনের কাম্য ছিল, ওজায়গা ছেড়ে শহরে আসতে ইচ্ছেও হত না। বছর-দুই কাটল আরও, ইতিমধ্যেই সে বিবাহ করেছে, সস্ত্রীক ওখানেই থাকে।

আজ তিন দিন হল সে কলকাতায় এসেছে প্রায় পাঁচ-ছ-বছর পরে।

কাজকর্ম সেরে কেমন একটা ইচ্ছে হল, ভাবলে—দেখি তো সেই সাহেবের বাড়িতে আমার সেই গাছটা আছে কিনা? বাড়িটা চিনে নিতে কষ্ট হল না কিন্তু অবাক হয়ে গেল—বাড়ির সে শ্রী আর নেই। বাড়িটাতে বোধ হয় মানুষ বাস করেনি বছর-দুই—কী তার বেশি। উঠোনে বন হয়ে গিয়েছে। পৈঠাগুলো ভাঙা, বাতাবি লেবুগাছে মাকড়সার জাল, বারান্দার রেলিংগুলো খসে পড়েছে। তার সেই এরিকা পামটা আছে, কিন্তু কী চেহারাই হয়েছে। আরও বড় হয়েছে বটে কিন্তু সে তেজ নেই, শ্রী নেই, নীচের ডালগুলো

শুকিয়ে পাখা হয়ে আছে, ধুলো আর মাকড়সার জালে ভরতি। যায় যায় অবস্থা। টবও বদলানো হয়নি আর।

হিমাংশু বললে—ভাই সত্যি সত্যি তোমায় বলচি, গাছটা যেন আমায় চিনতে পারলে। আমার মনে হল ও যেন বলচে আমায় এখান থেকে নিয়ে যাও, আমি তোমার কাছে গেলে হয়তো এখনও বাঁচব! ছেড়ে যেও না এবার। আমায় বাঁচাও।

রাত্রে হিমাংশুর ভালো ঘুম হল না। আবার সার্কুলার রোডে গেল, সন্ধান নিয়ে জানলে সাহেব মারা গিয়েছে। বুড়ি মেম আছে ইলিয়ট রোডে, পয়সার অভাবে বাড়ি সারাতে পারে না, তাই ভাড়াও হচ্ছে না। এই বাজারে ভাঙা বাড়ি কেনার খদ্দেরও নেই।

মেমকে টাকা দিয়ে গাছটা ও কিনে নিলে। এখন ও সার্কুলার রোডের বাড়িটাতেই আছে, কাল ও গালুডিতে ফিরে যাবে, গাছটাকে নিয়ে যাচ্চে সঙ্গে করে।

বিদায় নেবার সময় হিমাংশু বললে—বৈঠকখানা বাজারে এসেছিলাম কেন জানো? আমার সাধ হয়েচে ওর বিয়ে দেব। তাই একটা ছোটোখাটো, অল্প বয়সের, দেখতে ভালো পাম খুঁজছিলাম। হি-হি—পাগল নয় হে পাগল নয়, ভালোবাসার জিনিস হত তো বুঝতে।